بسم اللہ الرحمن الرحیم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১২ জুন, ২০২০ মোতাবেক ১২ এহসান, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেনঃ

আজ আমি যেসব সাহাবীর (রা.) স্মৃতিচারণ করব তাদের একজন হলেন, হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)। হযরত সাঈদ (রা.)-এর পিতার নাম ছিল যায়েদ বিন আমর আর তার মাতার নাম ছিল ফাতেমা বিনতে বা'জাহ্। তিনি আদি বিন কা'ব বিন লোই গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)-এর উপনাম আবুল আ'ওয়ার ছিল, যদিও কেউ কেউ আবু সওত-ও বলেছেন। তিনি দীর্ঘকায়, গোধুম বর্ণবিশিষ্ট ছিলেন আর (তার মাথার) চুল ছিল ঘন। তিনি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর চাচাতো ভাই ছিলেন। তার বংশবৃক্ষ চতুর্থ পুরুষে নুফায়েল পর্যন্ত গিয়ে হযরত উমর (রা.)-এর সাথে মিলিত হয়। এছাড়া অষ্টম পুরুষে কা'ব বিন লোই পর্যন্ত গিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে মিলিত হয়। হযরত সাঈদ (রা)-এর বোন আতেকার বিয়ে হয় হযরত উমর (রা.)-এর সাথে আর হযরত উমর (রা.)-এর বোন ফাতেমার বিয়ে হয়েছিল হযরত সাঈদ (রা.)-এর সাথে। ইনি সেই বোন যিনি হযরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছিলেন। হযরত সাঈদ (রা.)-এর পিতা যায়েদ বিন আমর অজ্ঞতার যুগে এক খোদার উপাসনা করতেন এবং হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ধর্মের অনুসন্ধান করতেন আর বলতেন, যিনি ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রভু তিনিই আমার প্রভু এবং ইব্রাহীম (আ.)-এর ধর্মই আমার ধর্ম। সে যুগেও একেশ্বরবাদী মানুষ ছিল। কতিপয় শিশুও প্রশ্ন করে থাকে যে, ইসলামের পূর্বে মহানবী (সা.)-এর ধর্ম কী ছিল আর তিনি কার ইবাদত করতেন? (অতএব এর উত্তর হলো) মহানবী (সা.) তো সবচেয়ে বড় একেশ্বরবাদী ছিলেন আর তিনি তখনও এক খোদারই ইবাদত করতেন। যায়েদ বিন আমর সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতা হতে, এমনকি মুশরেকদের জবাইকৃত পশুর মাংস ভক্ষণ করা থেকেও বিরত থাকতেন। মহানবী (সা.)-এর নবী হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে একবার তাঁর (সা.) সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। সহীহ্ বুখারীতে এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে রয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) রেওয়ায়েত করেন, মহানবী (সা.)-এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি (সা.) যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েলের সাথে বালদা নামক স্থানের নিম্নভূমিতে সাক্ষাৎ করেন অর্থাৎ এটি তাঁর (সা.) নবুয়্যতের দাবির পূর্বের কথা। বালদা হলো মক্কার পশ্চিমে অবস্থিত একটি উপত্যকার নাম। মক্কার দিকে যাওয়ার সময় তানঈমের পথে এটি অবস্থিত। মহানবী (সা.)-এর সামনে দস্তরখান রাখা হলে তিনি (সা.) খেতে অস্বীকৃতি জানান। তখন যায়েদ বলেন, আমিও সেগুলো খাই না যা তোমরা তোমাদের প্রতিমার নামে জবাই কর, আর আমি কেবল তা-ই ভক্ষণ করি যার ওপর আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়। মহানবী (সা.) এই সাবধানতাবশত খান নি যে, এগুলো আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো নামে জবাই করা জিনিস। এতে যায়েদও বলেন যে, আমিও আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো নামে জবাই করা জিনিস বা পশুর মাংস ভক্ষণ করি না। রেওয়ায়েতের পরের অংশে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, যায়েদ বিন আমর কুরাইশদের কুরবানীকে ত্রুটিযুক্ত মনে করতেন এবং বলতেন, ছাগলকে আল্লাহ্

তা’লা সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে এর জন্য পানি বর্ষণ করেছেন আর ভূমি থেকে এগুলোর জন্য ঘাস উদ্গাত করেছেন অথচ তোমরা এগুলোকে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো নামে জবাই কর! অর্থাৎ আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো নামে জবাই করাকে তিনি অপছন্দ করতেন এবং এটিকে অনেক বড় পাপ জ্ঞান করতেন। যায়েদ বিন আমর কুফর ও শির্ক এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সত্যের অন্বেষণে দূরদূরান্তের বিভিন্ন দেশ সফর করেন। তার এই সফর সম্পর্কে সহীহ্ বুখারীতে আরেকটি রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

হযরত ইবনে উমর বর্ণনা করেন, যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েল সত্য ধর্মের সন্ধান ও অনুসরণের জন্য সিরিয়ার দিকে যান। সেখানে এক ইহুদি আলেমের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাকে তার ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। সেই ইহুদি আলেমকে তিনি বলেন, আমাকে (আপনাদের ধর্ম সম্পর্কে) বলুন, হয়ত আমি আপনাদের ধর্ম গ্রহণ করতে পারি। সে বলল, আমাদের ধর্মের অনুসরণ করো না, কেননা এটি বিকৃত হয়ে গেছে, নতুবা তুমিও ঐশী কোপানলে পতিত হবে। যায়েদ বলেন, আমি তো আল্লাহ্র ক্রোধ এড়ানোর চেষ্টা করছি আর আমি আল্লাহ্ তা’লার অসন্তুষ্টি কখনো সহ্য করতে পারব না, অধিকন্তু এটি সহ্য করার শক্তিও আমার নেই। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি আমাকে এ ছাড়া অন্য কোন ধর্মের সন্ধান দিতে পার? সেই ইহুদি আলেম বলল, আমি কেবল এটিই জানি যে, মানুষের ‘হানীফ’ (তথা একত্ববাদী) হওয়া উচিত। যায়েদ জিজ্ঞেস করেন, ‘হানীফ’ কী? সেই (ইহুদি) বলল, ইবরাহীমের ধর্ম, তিনি ইহুদিও ছিলেন না আর খ্রিষ্টানও না, তিনি কেবল এক আল্লাহ্র ইবাদত করতেন। এরপর যায়েদ সেখান থেকে বেরিয়ে একজন খ্রিষ্টান আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাকেও তিনি একই কথা বলেন। সেই (খ্রিষ্টান আলেম) বলল, তুমি কখনো আমাদের ধর্মের অনুসরণ করো না, অন্যথায় আল্লাহ্র অভিসম্পাতের শিকার হবে। যায়েদ বলেন, আমি আল্লাহ্র অভিসম্পাত এড়ানোর চেষ্টা করছি, কেননা আমি আল্লাহ্র অভিসম্পাত এবং তাঁর কোপানল সহ্য করতে পারব না আর তা সহ্য করার শক্তিও আমার নেই। তুমি কি আমাকে অন্য কোন ধর্মের দিশা দিতে পার? সেই খ্রিষ্টান বলল, আমি শুধু এটিই জানি যে, মানুষের ‘হানীফ’ (তথা একত্ববাদী) হওয়া উচিত। যায়েদ জিজ্ঞেস করেন, ‘হানীফ’ কী? সেই ব্যক্তি বলল, ইবরাহীমের ধর্ম। তিনি ইহুদিও ছিলেন না আর খ্রিষ্টানও না, বরং তিনি কেবল আল্লাহ্র ইবাদত করতেন। যায়েদ হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে তার মতামত শুনার পর সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। এরপর বাইরে খোলা মাঠে এসে তিনি তার দু’হাত তুলে দোয়া করেন, হে আমার আল্লাহ্! আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি হযরত ইবরাহীমের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত আছি। যায়েদ বিন আমর মহানবী (সা.)-এর যুগ পেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর (সা.) দাবির পূর্বেই তিনি পরলোক গমন করেছিলেন। হযরত আমের বিন রাবিআ বর্ণনা করেন যে, যায়েদ বিন আমর সত্য ধর্মের অন্বেষণে ছিলেন আর তিনি খ্রিষ্ট ধর্ম এবং ইহুদি ধর্ম আর প্রতিমা ও পাথরের পূজা করার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। তিনি নিজ জাতির সাথে মতভেদ করেন আর তাদের প্রতিমা এবং তার পিতা-পিতামহরা যাদের ইবাদত করত তাদেরকে পরিত্যাগ করার ঘোষণা দেন। এছাড়া তাদের জবাইকৃত পশুর মাংসও তিনি খেতেন না। একবার তিনি আমাকে বলেন, হে আমের! দেখ, আমার জাতির সাথে আমার মতের অমিল রয়েছে। আমি ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের অনুসারী এবং (তাঁর অনুসারী) যাঁর তিনি অর্থাৎ ইবরাহীম (আ.) ইবাদত করতেন। আর এরপর আমি ইসমাঈল (আ.) এর অনুসরণ করি যিনি এই ক্বিবলার দিকেই মুখ করে নামায পড়তেন। আর আমি ইসমাঈলের

বংশধরদের মধ্য থেকে একজন নবীর আগমনের অপেক্ষায় আছি। কিন্তু মনে হচ্ছে তাঁর সত্যায়ন, তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন এবং তাঁর সত্য নবী হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য আমি তাঁর যুগ পাবো না। হে আমের! যদি তুমি সেই নবীর যুগ পাও, তাহলে তাঁকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে। আমের বলেন, মহানবী (সা.) যখন আবির্ভূত হন, তখন আমি মুসলমান হয়ে যাই এবং মহানবী (সা.)-কে যায়েদ বিন আমরের বাণী ও সালাম পৌঁছে দেই। মহানবী (সা.) তার সালামের উত্তর দেন ও তার জন্য রহমতের দোয়া করেন এবং বলেন, আমি তাকে জান্নাতে নিজের আঁচল গুটাতে দেখেছি। যায়েদ বিন আমর নিজের একেশ্বরবাদী হওয়ার জন্য অত্যন্ত গর্ববোধ করতেন।

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর অজ্ঞতার যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েলকে দেখেছি যে, তিনি কা'বা ঘরের দেয়ালে হেলান দেয়া অবস্থায় বলছিলেন, হে কুরাইশরা! আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আমি ভিন্ন তোমাদের মাঝে আর কেউ ইবরাহীমের ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত নও। যায়েদ কন্যা-সন্তানদেরকে জীবিত কবরস্থ করতেন না। আরবের কতক গোত্রের রীতি ছিল যে, তারা নিজ কন্যাদেরকে জীবিত অবস্থায় মাটিতে পুঁতে ফেলতো; তিনি এটি করতেন না, বরং তিনি যদি অবগত হতেন যে, কেউ নিজ কন্যাকে হত্যা করতে উদ্যত তখন তিনি সেই ব্যক্তিকে বলতেন, একে মেরো না, একে হত্যা করো না, আমি তোমার স্থলে এর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করব। অতঃপর তিনি তাকে নিয়ে যেতেন। আর সে সাবালিকা হলে তার পিতাকে বলতেন, তুমি চাইলে আমি তাকে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি আর তুমি চাইলে আমি তার সব দায়িত্ব সম্পন্ন করব, অর্থাৎ বিয়েশাদি প্রভৃতির খরচাদি বহন করব। অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আসমা বিনতে আবু বকর বর্ণনা করেন, প্রথমোক্ত রেওয়ায়েত বুখারীর ছিল আর দ্বিতীয়টি ইতিহাসগ্রন্থ উসদুল গাবা-র রেওয়ায়েত। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর বর্ণনা করেন যে, আমি যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েলকে কাবার সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখেছি। তিনি বলছিলেন, হে কুরাইশরা! সেই সত্তার কসম যার হাতে যায়েদের প্রাণ, আমি ছাড়া তোমাদের কেউ ইব্রাহীমের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত নয়। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ্! হায়, আমি যদি তোমার ইবাদতের পছন্দনীয় পন্থা জানতাম তাহলে আমি সেভাবেই তোমার ইবাদত করতাম, কিন্তু আমি তা জানি না। এরপর তিনি নিজ হাতের তালুতে সিজদা করতেন।

সাঈদ বিন মুসাইয়েব থেকে বর্ণিত, যায়েদ বিন আমরের মৃত্যু মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পাঁচ বছর পূর্বে হয়েছে, সে সময় কুরাইশরা কাবাগৃহের পুনঃনির্মাণ করছিল। তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তিনি বলছিলেন, আমি ইব্রাহীমের ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি। হযরত সাঈদ বিন যায়েদের স্মৃতিচারণ হচ্ছিল, প্রাসঙ্গিকভাবে তার পিতার বর্ণনা চলে এসেছে। পুত্র ইসলামে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন, কিন্তু পিতার পুণ্যের কারণে এটিও ইতিহাসে সংরক্ষিত হয়ে আছে আর এ কারণে আমিও এখানে উল্লেখ করলাম, কেননা এসব রেওয়ায়েত বুখারীতেও রয়েছে। যাহোক এখন হযরত সাঈদ বিন যায়েদের অবশিষ্ট স্মৃতিচারণ করছি।

হযরত সাঈদ বিন যায়েদ এবং হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) একবার মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন এবং তাঁর কাছে যায়েদ বিন আমর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, অর্থাৎ হযরত সাঈদ এর পিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আল্লাহ্ যায়েদ বিন আমরকে ক্ষমা করুন এবং তার প্রতি কৃপা করুন, ইব্রাহীমের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত

অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। এরপর মুসলমানরা যখনই যায়েদ বিন আমরের উল্লেখ করত, তখন তার জন্য কৃপা ও মাগফিরাতের দোয়া করত। অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, মহানবী (সা.)-কে যখন যায়েদ বিন আমর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি (সা.) বলেন, তিনি কিয়ামত দিবসে একা-ই এক উম্মতের সমমর্যাদা নিয়ে উত্থিত হবেন।

যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত সাঈদ বিন যায়েদ হযরত উমরের ভগ্নিপতি ছিলেন আর হযরত সাঈদ বিন যায়েদের বোন আতেকা বিনতে যায়েদের বিয়ে হযরত উমর (রা.)-এর সাথে হয়েছিল। হযরত সাঈদ বিন যায়েদ এবং তার স্ত্রী হযরত ফাতেমা বিনতে খাত্তাব ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, অর্থাৎ প্রারম্ভেই তারা ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর দ্বারে আরকামে যাওয়ার পূর্বেই তারা ঈমান আনয়ন করেছিলেন। যেমনটি পূর্বেই আমি বলেছি, হযরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ ছিলেন হযরত সাঈদ (রা.)-এর স্ত্রী। গত এক খুতবায় এর বিস্তারিত বিবরণ হযরত খাব্বাব বিন আরত এর স্মৃতিচারণে দেয়া হয়েছিল, তথাপি এখানে যেহেতু সাঈদ (রা.)-এর কথা আলোচনা হচ্ছে তাই আমি এখানেও সংক্ষেপে কিছুটা বর্ণনা করছি।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে লিখেছেন,

হযরত হামযা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কেবল কয়েক দিন অতিবাহিত হতেই, আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে আরেকটি আনন্দের উপলক্ষ্য দান করেন অর্থাৎ ইসলামের কট্টর বিরোধী হযরত উমরও মুসলমান হয়ে যান। হযরত উমরের প্রকৃতিতে শুরু থেকেই কঠোরতা ছিল, কিন্তু ইসলামের শত্রুতা তাতে নুতন মাত্রা যোগ করেছে। যেমন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি অসহায় ও দুর্বল মুসলমানদেরকে তাদের ইসলাম গ্রহণের কারণে অনেক বেশি কষ্ট দিতেন। একদিন তিনি ভাবলেন, এদেরকে তো আমি কষ্ট দিয়েই যাচ্ছি, কিন্তু এরা বিরত হচ্ছে না এবং নিজেদের বিশ্বাসে তারা দৃঢ়-অবিচল। এ নৈরাজ্যের হোতাকে শেষ করে দিলেই তো হয়। এ উদ্দেশ্যে তিনি ঘর থেকে বের হন, তার হাতে ছিল নগ্ন তরবারি। পথিমধ্যে জনৈক ব্যক্তির সাথে দেখা হয়; সে বলে, হে উমর! এত ক্রুদ্ধ হয়ে নগ্ন তরবারি হাতে কোথায় যাচ্ছ? তিনি বলেন, আজ আমি মুহাম্মদের (সা.) ভবলীলা সাঙ্গ করতে যাচ্ছি। সেই ব্যক্তি বলে, আগে নিজের বাড়ির খোঁজ নাও। তোমার বোন ও ভগ্নিপতিও মুসলমান হয়ে গিয়েছে। একথা শুনে হযরত উমর তৎক্ষণাৎ নিজের গন্তব্য বদল করে তার বোনের বাড়ি-অভিমুখে যাত্রা করেন। যখন বাড়ির কাছে পৌঁছেন, ভেতর থেকে কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের শব্দ ভেসে আসছিল; খাব্বাব বিন আরত খুব সুললিত কণ্ঠে তা পাঠ করছিলেন। এই শব্দ শুনে হযরত উমরের ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পায়। দ্রুতবেগে হঠাৎ দরজা খুলে তিনি ঘরে প্রবেশ করেন। যাহোক এ শব্দ পেতেই খাব্বাব চট করে কোন জায়গায় আত্মগোপন করেন, পর্দার পেছনে বা কোন এক স্থানে, যেখানে লুকানোর জায়গা ছিল, আর তার বোন ফাতেমা তড়িৎ কুরআন শরীফের পৃষ্ঠাগুলো কোন জায়গায় লুকিয়ে ফেলেন। হযরত উমর তখন হযরত ফাতেমা ও হযরত সাঈদকে বলেন, শুনলাম তোমরা নাকি নিজেদের ধর্ম ছেড়ে দিয়েছ? আর একথা বলেই তার ভগ্নিপতি সাঈদ বিন যায়েদকে প্রহার করা আরম্ভ করেন। ফাতেমা নিজের স্বামীকে বাঁচানোর জন্য মাঝখানে দাঁড়িয়ে যান, কিন্তু হযরত উমরের হামলা এমন ভয়াবহ ছিল যে, তা হযরত ফাতেমার উপরও গিয়ে পড়ে এবং তিনি আহত হন। যাহোক ক্ষতবিক্ষত ফাতেমার সাহস বৃদ্ধি পায়; তিনি দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, উমর! হ্যাঁ, আমরা মুসলমান হয়ে গিয়েছি, তুমি যা করতে পার কর, কিন্তু আমরা

ইসলাম পরিত্যাগ করব না। যাহোক, বোনের এরূপ সাহসিকতাপূর্ণ ও নির্ভিক উত্তর শুনে হযরত উমর চোখ তুলে তাকালে দেখতে পান যে, তার বোনও রক্তে রঞ্জিত হয়ে আছেন। তিনি এতটাই আঘাত পেয়েছিলেন যে, তার চেহারা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। এই দৃশ্য হযরত উমর (রা.)-এর প্রকৃতিতে গভীরভাবে রেখাপাত করে আর তাৎক্ষণিকভাবে তিনি বলেন, তোমরা যা পড়ছিলে সেই বাণী আমাকে দেখাও। এটি শুনে হযরত ফাতেমা (রা.) বলেন, না, এগুলো এভাবে দেখানো যাবে না, কেননা তুমি সে পৃষ্ঠাগুলো নষ্ট করে ফেলবে। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি অঙ্গীকার করছি যে, আমি এমনটি করবো না। এগুলো তোমাদেরকে ফেরত দিয়ে দিবো। তখন হযরত ফাতেমা (রা.) বলেন, তবুও এগুলো এভাবে দেখানো যাবে না। তুমি প্রথমে গোসল করে আস, তারপর দেখো। তিনি গোসল করে আসলে হযরত ফাতেমা (রা.) পবিত্র কুরআনের সেই পৃষ্ঠাগুলি বের করে তাঁর সামনে রেখে দেন। তিনি হাতে নিয়ে দেখেন, এগুলো সূরা ত্বাহা'র প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত ছিল। হযরত উমর (রা.) খুবই ত্রস্ত হৃদয়ে সে আয়াতগুলি পড়া আরম্ভ করেন। তাঁর প্রকৃতি যেহেতু পবিত্র ছিল, তদুপরি মহানবী (সা.)-এর দোয়াও ছিল, তাই তিনি যখন আয়াতগুলো পড়া আরম্ভ করেন তখন ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ তাঁর হৃদয়ে গেঁথে যেতে থাকে। পড়ার এক পর্যায়ে যখন তিনি নিম্নলিখিত আয়াতদ্বয়ে পৌঁছেন যে,

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ

(সূরা ত্বাহাঃ ১৫-১৬)

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি-ই এ বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও অধিপতি আল্লাহ্। আমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই। সুতরাং তোমাদের উচিত কেবল আমারই ইবাদত করা এবং আমার স্মরণে নামায কায়েম করা। দেখ, প্রতিশ্রুত মুহূর্ত অচিরেই আসছে। কিন্তু আমরা সেই সময়কে গোপন রেখেছি যেন প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের প্রতিদান প্রাপ্ত হয়।

এই আয়াত পড়তেই হযরত উমর (রা.) সম্বিৎ ফিরে পান এবং অবলীলায় বলে উঠেন, কী বিস্ময়কর বাণী আর কতই না পবিত্র বাণী! হযরত খাব্বাব (রা.) লুকিয়ে ছিলেন, এ কথা শুনে তিনি বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এরপর বলেন, তোমার মাঝে যে পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে তা মহানবী (সা.)-এর দোয়ারই ফসল, কেননা খোদার কসম! গতকালই আমি তাঁকে (সা.) এই দোয়া করতে শুনেছি যে, হে আল্লাহ্! তুমি উমর ইবনুল খাত্তাব অথবা আমর বিন হিশাম অর্থাৎ আবু জাহল-এর মধ্য থেকে যে কোন একজন ইসলামকে দান কর। যাহোক, হযরত উমর (রা.) এটি শুনে হযরত খাব্বাব (রা.)-কে বলেন, আমাকে বল মহানবী (সা.) কোথায় আছেন? তখনও তরবারি পূর্বের ন্যায় খাপের বাইরে তার হাতেই ছিল। মহানবী (সা.) তখন দ্বারে আরকামে অবস্থান করছিলেন। যাহোক, খাব্বাব তাকে সেখানকার ঠিকানা বলে দেন। হযরত উমর সেখানে গিয়ে দরজায় সজোরে কড়া নাড়েন। সাহাবীরা দরজার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখেন, হযরত উমর নগ্ন তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। এটি দেখে তারা দরজা খুলতে ইতস্তত করেন। মহানবী (সা.) বলেন, দরজা খুলে দাও। হযরত হামযাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও বলেন,

দরজা খুলে দাও। সে যদি সদিচ্ছা নিয়ে এসে থাকে তাহলে ভালো কথা, কিন্তু যদি দুরভিসন্ধি থাকে তবে তার তরবারি দিয়েই তার শিরোচ্ছেদ করব। দরজা খোলা হয়। হযরত উমর নগ্ন তরবারি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন। মহানবী (সা.) নিজের জামার কিনারা টেনে জিজ্ঞেস করেন, হে উমর! কী উদ্দেশ্যে এসেছ? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি মুসলমান হতে এসেছি। মহানবী (সা.) একথা শুনে আনন্দে আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চকিত করেন। বর্ণিত আছে যে, তখন সাহাবীরাও এত জোরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চকিত করেন যে, মক্কার পাহাড়গুলোতেও সেই আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়।

অতএব, ইনি ছিলেন হযরত সাঈদ যিনি হযরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ ছিলেন। হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) প্রাথমিক হিজরতকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মদিনা পৌঁছে তিনি হযরত আবু লুবাবার ভাই হযরত রিফা বিন আব্দুল মুনযেরের ঘরে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) হযরত রা'ফে বিন মালেকের সাথে তার ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করে দেন, তবে অপর একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত উবাই বিন কা'বের সাথে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করেন। হযরত সাঈদ বিন যায়েদ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি; কিন্তু তা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) (বদরের) যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তাকে অংশীদার করেছেন। এজন্য যেসব সাহাবী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন বা মহানবী (সা.) কোন না কোনভাবে যাদেরকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ দিয়ে বদরে অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন আমিও তাদেরকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছি। হযরত সাঈদ বিন যায়েদের বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কারণ হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ'র স্মৃতিচারণে উল্লেখ করা হয়েছে তথাপি এখানেও বর্ণনা করা জরুরী, তাই বর্ণনা করছি।

এমনিতেও এটি বর্ণনা করার প্রায় দু'তিন মাস কেটে গেছে আর এখানেও বর্ণনা করা প্রয়োজন তাই করছি। যাহোক হযরত সাঈদ বিন যায়েদের বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার যে কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো- কুরাইশদের একটি কাফেলার সিরিয়া থেকে রওনা হওয়ার বিষয়ে ধারণা করে রসূলুল্লাহ্ (সা.) মদিনা থেকে তাঁর যাত্রার দশদিন পূর্বে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদকে কাফেলার সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। তারা আওরা নামক স্থানে পৌঁছেন। কাফেলা সেই পথ অতিক্রম না করা পর্যন্ত তারা সেখানেই অবস্থান করেন। আওরা লোহিত সাগরের তীরবর্তী একটি যাত্রাবিরতি স্থান, হিজায ও সিরিয়ায় যাতায়াতকারী কাফেলাগুলো এ পথ দিয়েই যাতায়াত করত। যাহোক, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ এবং হযরত সাঈদ এর ফিরে আসার পূর্বেই এ সংবাদ পেয়ে যান যে, কাফেলাটি সেখান থেকে চলে গেছে। তাদের এদিকে আসার কোন ইচ্ছা নেই। তিনি (সা.) সাহাবীদের ডাকেন এবং কুরাইশ কাফেলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সঠিক সংবাদ জানা ছিল না, কিন্তু এ কথা জানা যায় যে, এদিকে আসার পরিবর্তে কাফেলা উপকূলীয় পথ ধরে দ্রুত সটকে পড়েছে। সন্ধানীদের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য তারা দিন রাত সফর অব্যহত রাখে আর যে পথে তাদের আসার সম্ভাবনা ছিল সে পথে আসে নি, ফলে উভয় কাফেলা মুখোমুখি হয় নি। হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ ও হযরত সাঈদ বিন যায়েদ এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এই কাফেলার সংবাদ দেওয়ার জন্য মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তারা জানতেন না যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বদরের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে যাত্রা করেছেন। তারা দু'জন মদিনাতে সেদিন এসে পৌঁছেন যেদিন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বদরের

প্রান্তরে কুরাইশ বাহিনীর মুখোমুখি হয়েছেন। তাদের উভয়েই রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হবার জন্য মদিনা থেকে যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে মহানবী (সা.)-এর বদর থেকে ফিরতি পথে তুরবান নামক স্থানে তাঁর সাথে মিলিত হন। তুরবান মদিনা থেকে আনুমানিক ১৯ মাইল দূরে অবস্থিত একটি উপত্যকা যেখানে অনেক বেশি পরিমাণে মিষ্টি পানির কূপ রয়েছে। বদরের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এ স্থানে কিছু সময় অবস্থান করেছিলেন। যে বানিজ্য কাফেলা চলে গিয়েছিল আর বদর প্রান্তরে মক্কা থেকে আগত যে বাহিনীর সাথে যুদ্ধ হয়েছিল, এটি ভিন্ন কাফেলা ছিল। যাহোক, রসূলুল্লাহ্ (সা.) মদিনা থেকে এই কাফেলার উদ্দেশ্য বুঝার জন্য বের হয়েছিলেন। জানা ছিল না যে, একটি সেনাবাহিনীও আসছে। যাহোক ঘটনার পরবর্তী অংশ হলো, হযরত তালহা ও হযরত সাঈদ সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) বদরের যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তাদেরকে অংশীদার করেছিলেন আর এই দু'জনকেও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়।

হযরত সাঈদ বিন যায়েদ 'আশারায়ে মুবাশ্বেরা' অর্থাৎ, সেই দশজন সৌভাগ্যবান সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখে এ পৃথিবীতেই জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, আব্দুর রহমান বিন অউফ, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, সাঈদ বিন যায়েদ এবং আবু উবায়দা বিন জারাহ্দের প্রত্যেকের নাম নিয়ে বলেছেন যে, এরা জান্নাতী।

সাঈদ বিন যায়েদ বর্ণনা করেন, আমি নয়জন ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা জান্নাতী, আর দশম ব্যক্তি সম্পর্কেও আমি যদি এই সাক্ষ্য দেই, আমি গুনাহগার হব না। জিজ্ঞেস করা হলো, তা কীভাবে? তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সাথে হেরা পাহাড়ে অবস্থান করছিলাম, তখন সেটি প্রকম্পিত হতে থাকে। এতে মহানবী (সা.) বলেন, হে হেরা! স্থির থাক। নিশ্চিয় তোমার বুকে একজন নবী বা সিদ্দীক অথবা শহীদ অবস্থান করছেন। কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, সেই দশজন জান্নাতী ব্যক্তি কারা? হযরত সাঈদ বিন যায়েদ বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.), আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, সা'দ এবং আব্দুর রহমান বিন অউফ। এরপর প্রশ্ন করা হলো, দশম ব্যক্তি কে? তখন হযরত সাঈদ বিন যায়েদ বলেন, সেই ব্যক্তি আমি। হযরত সাঈদ বিন যুবায়ের বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের, হযরত সা'দ, হযরত আব্দুর রহমান এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদ রণক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে থাকতেন অর্থাৎ তাঁর (সা.) সুরক্ষা করতেন এবং নামাযে তাঁর (সা.) পেছনে দাঁড়াতেন।

হাকীম বিন মুহাম্মদ তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত সাঈদ বিন যায়েদের আংটিতে পবিত্র কুরআনের আয়াত লিপিবদ্ধ দেখেছেন। হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে সিরিয়ার অভিযানে যখন রীতিমত সেনা অভিযান চালানো হয় তখন হযরত সাঈদ বিন যায়েদ হযরত আবু উবায়দার অধীনে পদাতিক বাহিনীর দায়িত্বে নিযুক্ত হন। দামেস্ক অবরোধ এবং ইয়ারমুকের চূড়ান্ত যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং জীবন বাজি রেখে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের সময় হযরত সাঈদ বিন যায়েদকে দামেস্কের গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনি হযরত আবু উবায়দাকে লিখেন যে, আপনারা জিহাদ

করবেন আর আমি এ থেকে বঞ্চিত থাকব– আমি এমনটি করতে পারি না। তাই চিঠি পাওয়া মাত্রই আমার জায়গায় অন্য কাউকে নিযুক্ত করুন যেন যথাশীঘ্র আমি আপনার কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারি। হযরত আবু উবায়দা বাধ্য হয়ে ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানকে পাঠিয়ে দেন এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদ পুনরায় যুদ্ধে যোগদান করেন। হযরত সাঈদ বিন যায়েদের সম্মুখে অনেক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, অনেক গৃহযুদ্ধ হয়েছে। তিনি তার জগতের প্রতি অনিহা ও তাকওয়ার কারণে এসব ঝগড়া-বিবাদ সর্বদা এড়িয়ে চলতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও যার সম্পর্কে যে মতামত পোষণ করতেন তা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদতের পর তিনি প্রায় সময়ই কুফার মসজিদে বলতেন যে, তোমরা উসমানের সাথে যে ব্যবহার করেছ এর ফলে যদি উহুদ পাহাড়ও প্রকম্পিত হয় তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। একইভাবে একদিন কুফার জামে মসজিদে মুগীরা বিন শো'বা হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে মন্দ কথা বললে হযরত সাঈদ বিন যায়েদ বলেন, হে মুগীরা বিন শো'বা! হে মুগীরা বিন শো'বা! হে মুগীরা বিন শো'বা! আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, এরা দশজন জান্নাতে থাকবে আর তাদের একজন হলেন হযরত আলী। হযরত সাঈদ বিন যায়েদের দোয়া আল্লাহ্ তা'লার দরবারে গৃহীত হতো। একবার কেউ তার বিরুদ্ধে জমি জবরদখল করার অভিযোগ আনে। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, হযরত সাঈদ বিন যায়েদের জমির সাথে যে জমিটি ছিল তা ছিল আরওয়া বিনতে ওয়ায়েস নামের এক মহিলার। সে হযরত মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে মদিনায় নিযুক্ত গভর্নর মারওয়ান বিন হাকামের নিকট অভিযোগ করে যে, সাঈদ অন্যায়ভাবে আমার জমি দখল করে নিয়েছে। মারওয়ান তদন্ত করার জন্য কাউকে নিযুক্ত করেন তখন হযরত সাঈদ তাকে জবাব দেন যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত পরিমাণ ভূমি জবরদখল করবে কেয়ামতের দিন সেই জমির সাতটি স্তর তার গলার বেড়ি হয়ে যাবে- তোমার কী ধারণা, মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে একথা শোনার পরও আমি অন্যায় করতে পারি? এরপর তিনি বলেন, হে আল্লাহ্! আরওয়া যদি মিথ্যা বলে থাকে তাহলে তাকে সেই সময় পর্যন্ত মৃত্যু দিও না যতক্ষণ তার দৃষ্টিশক্তি চলে না যায় এবং তার ঘরের কূপ তার কবর না হয়। সুতরাং লেখা আছে যে, আরওয়া প্রথমে তার দৃষ্টিশক্তি হারায় এরপর একদিন হাঁটতে গিয়ে নিজের ঘরের কূপে পড়ে মারা যায়। এরপর এটি একটি প্রবাদ হয়ে যায় আর মদিনাবাসী বলতে আরম্ভ করে যে, 'আ'মাকাল্লাহু কামা আমা আরওয়া'। অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাকে সেভাবে অন্ধ করুন যেভাবে আরওয়াকে অন্ধ করেছিলেন। হযরত সাঈদ বিন যায়েদ পঞ্চাশ বা একান্ন হিজরী সনে প্রায় ৭০ বছর বয়সে জুমুআর দিন মৃত্যুবরণ করেন। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী মুত্যুর সময় তার বয়স ৭০ বছরের বেশি ছিল। মদিনার পার্শ্ববর্তী আকীক নামক জায়গায় তার স্থায়ী নিবাস ছিল। আরব উপদ্বীপে আকীক নামের অনেক উপত্যকা ছিল। সেগুলোর মাঝে মদিনার আকীক উপত্যকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা মদিনার দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে নিয়ে উত্তর-পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত আর এতে মদিনা মুনাওয়ারার সকল উপত্যকা এসে মিলিত হয়। যাহোক, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর জুমুআর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। হযরত সাঈদ এর মৃত্যুর সংবাদ শুনে তিনি জুমুআতে না গিয়ে তখনই আকীকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস গোসল করান আর তার মৃতদেহ লোকেরা কাঁধে করে মদিনায় নিয়ে আসে। এরপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর জানাজার নামাজ পড়ান আর মদিনায় তাকে সমাহিত করা হয়। অপর এক রেওয়াতে অনুযায়ী হযরত

আব্দুল্লাহ্ বিন উমর যখন হযরত সাঈদ বিন যায়েদের মৃতুসংবাদ শুনেন, তখন তিনি জুমুআতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি জুমুআতে যান নি বরং তার বাড়ি গিয়ে তাকে গোসল করান, সুগন্ধি লাগান, অতঃপর তার জানাজার নামাজ পড়ান। কিন্তু আয়েশা বিনতে সা'দ বর্ননা করেন যে, হযরত সাঈদ বিন যায়েদকে হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস গোসল করান, সুগন্ধি লাগান, এরপর ঘরে এসে নিজেও গোসল করেন। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তিনি বলেন, হযরত সাঈদ বিন যায়েদকে গোসল করানোর কারণে আমি গোসল করি নি বরং গরমের কারণে আমি গোসল করেছি। হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)-এর জানাযার নামায পড়ান হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)। হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) এ দু'জনই কবরে নামেন অর্থাৎ লাশ কবরে নামানোর জন্য নামেন।

হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) বিভিন্ন সময়ে দশটি বিয়ে করেছিলেন আর সেই স্ত্রীদের ঘরে ১৩জন পুত্র এবং ১৯জন কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর, এ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলে দিচ্ছি। অজ্ঞতার যুগে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর নাম ছিল আবদে আমর। অপর একটি বর্ণনা মতে তার নাম ছিল আব্দুল কা'বা। ইসলাম গ্রহণ করার পর মহানবী (সা.) তার এই নাম পরিবর্তন করে আব্দুর রহমান রেখে দেন। তিনি বনু যোহরা বিন কিলাব গোত্রের সদস্য ছিলেন। সাহলা বিনতে আসেম বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) ফর্সা, সুন্দর চোখ, লম্বা পলক ও খাঁড়া নাকের অধিকারী ছিলেন। তার ওপরের দিকের ছেদন দাঁত ছিল লম্বা এবং কানের লতি পর্যন্ত চুল ছিল। এছাড়া তিনি দীর্ঘ গ্রীবা, দৃঢ় হাতের তালু ও মোটা আঙ্গুলের অধিকারী ছিলেন। হযরত ইব্রাহীম বিন সাঈদ তার পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) দীর্ঘকায়, ফর্সা বর্ণ যাতে লালাভ মিশ্রণ ছিল, সুদর্শন এবং কোমল ত্বকের অধিকারী ছিলেন আর তিনি খিজাব লাগাতেন না। তার সম্পর্কে বলা হয়, তিনি কিছুটা খঞ্জ ছিলেন আর এটি হয়েছে উহুদের যুদ্ধের পর। কেননা উহুদের যুদ্ধে তিনি আল্লাহ্ তা'লার পথে আহত হয়েছিলেন।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) সেই দশজন সাহাবীর একজন ছিলেন যারা তাদের জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছিলেন। তিনি শুরার সেই ছয় সদস্যের একজন ছিলেন যাদেরকে হযরত উমর (রা.) খিলাফতের নির্বাচনের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন। সেই ব্যক্তিবর্গের সম্পর্কে হযরত উমর (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) তাঁর মৃত্যুর সময় এদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) আমুল ফীল অর্থাৎ হস্তিবাহিনী সংক্রান্ত ঘটনার ১০ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি (রা.) সেই গুটিকতক ব্যক্তির একজন ছিলেন যারা অজ্ঞতার যুগেও মদ পান করাকে নিজেদের জন্য হারাম জ্ঞান করতেন। তিনি (রা.) ইসলামের প্রথম ৮ জন মুসলমানের একজন ছিলেন। মহানবী (সা.) দ্বারে আরকামকে প্রচারকেন্দ্র হিসেবে অবলম্বনের পূর্বেই হযরত আবু বকর (রা.)-এর তবলীগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) ইথিওপিয়ার উভয় হিজরতেই অংগ্রহণ করেছিলেন। সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েত হলো, হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) বর্ণনা করেন, আমাদের মদিনায় আসার পর রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে এবং হযরত সা'দ বিন রবি (রা.)-কে পরস্পর ভাই-ভাই বানিয়ে দেন। তখন সা'দ বিন রবি (রা.) বলেন, আমি আনসারদের মাঝে অধিক সম্পদশালী, কাজেই আমি (আমার সম্পদ) ভাগ করে অর্ধেকটা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি, আর আমার দুইজন স্ত্রীর মধ্যে থেকে

যাকে আপনার পছন্দ হয় তাকে আমি আপনার জন্য ছেড়ে দিব। তার ইদ্দত পূর্ণ হবার পর আপনি তাকে বিয়ে করুন। একথা শুনে হযরত আব্দুর রহমান (রা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনার ধন ও জনসম্পদে বরকত দিন, আমার এসবের কোন প্রয়োজন নেই। আপনি শুধু বলুন, এখানে কোন বাজার আছে কি, যেখানে ব্যবসাবাণিজ্য হয়? হযরত সা'দ (রা.) বলেন, কায়নুকার বাজার রয়েছে। এটি জানার পর হযরত আব্দুর রহমান (রা.) প্রভাতে সেখানে যান এবং ব্যবসা করেন। সেখান থেকে লভ্যাংশ হিসেবে পনির ও ঘি নিয়ে আসেন আর তা নিয়ে হযরত সাদের বাড়িতে আসেন। এভাবে তিনি প্রতিদিন সকালে সেই বাজারে যান, ব্যবসা করেন এবং আয়-উপার্জন করতে থাকেন। কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত আব্দুর রহমান (রা.) আসেন এবং তার গায়ে জাফরানের চিহ্ন ছিল। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি বিয়ে করেছ? তিনি বলেন, জ্বী, হ্যাঁ। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কাকে? উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, এক আনসারী মহিলাকে। তখন তিনি (সা.) জানতে চান, দেনমোহর কত দিয়েছ? তিনি (রা.) বলেন, একটি খেজুর-আঁটি সমপরিমাণ স্বর্ণ অথবা স্বর্ণের একটি আঁটি। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, একটি ছাগল জবাই করে হলেও বউভাত কর। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বর্ণনা করেন, আমার এমনও হয়েছে যে, আমি কোন পাথর উঠালেও আশা করতাম, (এর) নীচে সোনা কিংবা রূপা পাওয়া যাবে অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা (তাঁর) ব্যবসায় এতটা বরকত দিয়েছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বদর এবং উহুদসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে যোগদান করেন। বদরের যুদ্ধের একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, বদরের যুদ্ধে আমি সৈন্য-সারিতে দাঁড়ানো ছিলাম, এমন সময় আমি আমার ডানে ও বামে তাকালাম। আমি দেখলাম আমার ডানে ও বামে দু'জন অল্প বয়স্ক আনাসারী বালক দাঁড়িয়ে আছে। তখন আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, হায়! আমার উভয় পাশে যদি দু'জন এমন মানুষ থাকত যারা হবে এদের চেয়ে শক্তিশালী ও বলিষ্ঠদেহী! এ অবস্থায় তাদের একজন আমার হাতে চাপ দিয়ে জিজ্ঞেস করল, চাচা! আপনি কি আবু জাহলকে চিনেন? আমি বললাম হ্যাঁ, কিন্তু ভাতিজা! তার সাথে তোমার কী কাজ? সে বলল, আমাকে বলা হয়েছে, সে মহানবী (সা.)-কে গালমন্দ করে। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি যদি তাকে একবার দেখতে পাই তাহলে আমাদের দু'জনের মধ্যে যার মৃত্যু প্রথমে নির্ধারিত সে মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত আমার চোখ তার চোখ থেকে সরবে না। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, একথা শুনে আমি খুবই বিস্মিত হই। এরপর অপরজনও আমার হাতে চাপ দিয়ে একই কথা জিজ্ঞেস করল। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আবু জাহলকে আমি তার লোকদের মাঝে প্রদক্ষিণ করতে দেখলাম। আমি বললাম, তোমরা আমাকে যার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলে ঐ দেখ সেই ব্যক্তি। একথা শোনামাত্রই তারা দু'জন বিদ্যুৎ গতিতে নিজেদের তরবারি নিয়ে তার দিকে ছুটে যায় আর তাকে এতটা আঘত করে যে, প্রাণেই মেরে ফেলে। এরপর তারা ফিরে এসে মহানবী (সা.)-কে অবহিত করে। তখন তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে? উত্তরে তারা উভয়েই বলে, আমি তাকে হত্যা করেছি। পরে তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি তোমাদের তরবারি মুছে পরিষ্কার করে ফেলেছ? তারা বলল, না। তিনি (সা.) তরবারি দু'টি দেখে বলেন, তোমরা দু'জনেই তাকে হত্যা করেছ এবং তার যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুআয বিন আমর বিন জমূহ্ পাবে।

আর তাদের উভয়েরই নাম মুআয ছিল অর্থাৎ, মুআয বিন আফরা (রা.) এবং মুআয বিন আমর বিন জমূহ্ (রা.)। এটি সহীহ্ বুখারীর হাদীস।

আবু জাহলের হত্যা সম্পর্কিত এ ব্যাখ্যা পূর্বেও করা হয়েছে, পুনরায় বলে দিচ্ছি। কোন কোন হাদীসে রয়েছে, আফরার দুই ছেলে মুয়াওয়েয এবং মুআয আবু জাহলকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছিল, এরপর তার মুণ্ডু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.)। ইমাম ইবনে হাজ্‌র আসকালানী এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন যে, মুআয বিন আমর (রা.) এবং মুআয বিন আফরা (রা.)-এর পর হয়তো মুয়াওয়েয বিন আফরা (রা.)ও তাকে আঘাত করে থাকবেন। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা ফতহুল বারীতেও এটি লেখা আছে।

এই ঘটনাটি উল্লেখ করে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কার জননেতা ও কাফের সেনাদলের সেনাপতি আবু জাহল যখন বদরের যুদ্ধে সেনাদলকে বিন্যস্ত করছিল, এমন সময় আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর মতো অভিজ্ঞ জেনারেল বলেন, আমি আমার ডানে ও বামে ১৫ বছর বয়সী দু'জন আনসারী বালককে দেখতে পাই। তাদেরকে দেখে আমি ভাবলাম, আজ হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার সুযোগ নেই, কেননা দুর্ভাগ্যবশত আমার চতুর্দিকে অনভিজ্ঞ বালকরা দাঁড়িয়ে আছে, তারাও আবার আনসারী বালক, যুদ্ধ সম্পর্কে যাদের কোন সংস্রবই নেই। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, আমি এই চিন্তায় মগ্ন ছিলাম এমন সময় আমার শরীরের ডান পাশে (কারো) কনুই লাগে, আমার মনে হলো, ডান দিকের বালকটি কিছু বলতে চায়। আমি তার দিকে মুখ ফেরাতেই সে বলে, চাচা! একটু ঝুঁকে কথা শুনুন। আমি আপনার কানে কানে একটি কথা বলতে চাই যেন আমার সাথী শুনতে না পায়। তিনি বলেন, আমি তার দিকে কান বাড়িয়ে দিলে সে বলে, চাচা! আবু জাহল কে, যে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এত বেশি কষ্ট দিত? চাচা! আমার মন চায় আমি তাকে হত্যা করি। তিনি (রা.) বলেন, তার কথা শেষ হতে না হতেই আমার বাম দিকে (কারো) কনুই লাগে। তখন আমি আমার বাম দিকের বালকের দিকে ঝুঁকি আর বাম দিকের সেই বালকও একই কথা বলে যে, চাচা! রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে যে এত কষ্ট দিত সেই আবু জাহল কে? আমার মন চায় আমি আজ তাকে হত্যা করি। হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) বলেন, অভিজ্ঞ যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও আমি ভাবতেও পারতাম না যে, আবু জাহল, যে ছিল সেনাপতি, অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এবং সেনাপরিবেষ্টিত, তাকে আমি হত্যা করতে পারব। আমি অঙ্গুলি নির্দেশ করে একইসাথে উভয় বালককে বললাম, সামনে যে ব্যক্তি শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় লৌহবর্মের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, যার সামনে শক্তিশালী ও সাহসী যোদ্ধারা নগ্ন তরবারি হাতে প্রহরা দিচ্ছে, সে হলো আবু জাহল। আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে এটি বুঝিয়ে দেয়া যে, এ কাজ তোমাদের মতো অনভিজ্ঞ বালকদের জন্য সাধ্যাতীত। হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, কিন্তু যে আঙুল দিয়ে আমি ইশারা করেছিলাম তা নামিয়ে আনার পূর্বেই সেই আনসারী বালকদ্বয় চড়ুই পাখির ওপর বাজ পাখির আক্রমণ করার ন্যায় কাফিরসারিগুলোকে বিদীর্ণ করে আবু জাহলের দিকে ছুটে। আবু জাহলের সম্মুখে তার পুত্র ইকরামা দাঁড়িয়ে ছিল। সে অনেক সাহসী এবং অভিজ্ঞ জেনারেল ছিল। কিন্তু এই আনসার বালকেরা এত দ্রুতগতিতে দৌড়ে যায় যে, কেউ তাদের অগ্রসর হওয়ার উদ্দেশ্য বুঝে উঠতে পারে নি। চোখের পলকে তারা আবু জাহলের ওপর আক্রমণ করার জন্য কাফেরদের সারিগুলোকে বিদীর্ণ করে

একেবারে দেহরক্ষীদের কাছে পৌঁছে যায়। নগ্ন তরবারি হাতে যেসব দেহরক্ষী দাঁড়িয়ে ছিল, তারা সময়মতো নিজেদের তরবারিও নামিয়ে আনতে পারে নি। শুধুমাত্র একজন প্রহরীর তরবারি নীচে আসতে সক্ষম হয় যার ফলে একজন আনসার বালকের বাহু কেটে যায়। কিন্তু যাদের কাছে জীবন বলি দেয়া সহজ মনে হচ্ছিল তাদের জন্য বাহু কেটে যাওয়া কীইবা বাধ সাধতে পারত! যেভাবে পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর পতিত হয় ঠিক একইভাবে সেই বালকদ্বয় দেহরক্ষীদের ওপর বল প্রয়োগ করে আবু জাহলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই কাফের-সেনাপতিকে ভূপাতিত করে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বলেন, যুদ্ধের শেষের দিকে আমি সেখানে পৌঁছাই যেখানে আবু জাহল মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়েছিল। আমি বললাম, কী অবস্থা তোমার? সে বলল, আমি মারা যাচ্ছি, কিন্তু আক্ষেপ নিয়ে মারা যাচ্ছি। মারা যাওয়া কোন বড় বিষয় নয় কিন্তু আক্ষেপ হলো, হৃদয়ের বাসনা পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই আনসারদের দুই বালক আমাকে ভূপাতিত করেছে। মক্কাবাসীরা আনসারদের অনেক তুচ্ছ মনে করত। তাই অনেক আক্ষেপের সাথে সে এর উল্লেখ করে আর বলে, এই আক্ষেপ হৃদয়ে নিয়ে মারা যাচ্ছি যে, আনসারদের দু'জন ছোকরা আমাকে হত্যা করেছে। এরপর সে তাঁকে অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.)-কে বলে, আমি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি। তুমি কি আমার প্রতি এই অনুগ্রহটুকু করবে? অর্থাৎ তরবারির এক আঘাতে আমার জীবনাবসান ঘটাবে। কিন্তু আমার ঘাড়টা একটু লম্বা করে কাটবে, কেননা সেনাপতির চিহ্ন হলো তার ঘাড় লম্বা করে কাটা হয়। আমাকে হত্যা কর আর এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও মর্মে আবু জাহলের অনুরোধ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ মেনে নেন, কিন্তু তিনি চিবুকের কাছ থেকে তার গলা কাটেন। অর্থাৎ মৃত্যুলগ্নে তার এই বাসনাও পূর্ণ হয় নি যে, তার ঘাড় যেন লম্বা করে কাটা হয়।

শিশুদের মাঝেও মহানবী (সা.)-এর প্রতি কেমন প্রেম ও ভালোবাসা ছিল আর কীভাবে তারা তাঁর (সা.) শত্রুদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে চাইত– (তাদের) কুরবানী প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

এই ঘটনাটি পূর্বেও দু'একবার বর্ণনা করা হয়েছে। যাহোক মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাদের সবার এ ছিল কুরবানী ও এ ছিল ভালোবাসা আর এ ছিল প্রেম– যার কারণে নিজ প্রাণের কোন মায়া তাদের ছিল না। হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.)-এর বাকি স্মৃতিচারণ ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে করব।